


Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য


| | |
|---|---|
| Volume | 51 |
| Issue | 1 |
| Year | 2013 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | বিশ্বজিৎ ঘোষ |
| Published online | October 1, 2013 |
| DOI | 10.62328/sp.v51i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.1 |
| Pages | ৯-২০ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য

Check for updates

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

বর্তমান সময়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব (Post-colonial Theory) গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা হিসেবে বিবেচিত। উপনিবেশকালীন এবং উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলধারা অনুধাবনে এই তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আত্মসমীক্ষা এবং প্রতিরোধী চেতনাই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী চেতনা, কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্ক নির্ণয়, প্রতিবাদী নারীভাবনা, মিথ-পুরাণের নবনির্মাণ, নিম্নবর্গ সম্পর্কে সচেতনতা, স্বদেশপ্রেম ও দেশজ প্রকৃতিলগ্নতা এবং আপসহীন দ্রোহচেতনাই হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষিত হলে, ভিন্ন এক নজরুলকে আবিষ্কার করা সম্ভব। তবে নজরুলসাহিত্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের তাত্ত্বিক-পরিচয় ও সাহিত্যে তার প্রয়োগবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

২.

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য-শিল্পকলা-রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত (historically and conceptually) অনুসন্ধিৎসাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারণা। সতের-আঠার বা উনিশ শতকে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিল ইয়োরোপ। বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে ইয়োরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার শাসন ক্ষমতা দখল করেছে, লুণ্ঠন করেছে অধিকৃত ভূখণ্ডের সম্পদ, প্রচার করেছে খ্রিষ্টবাদ। সমুদ্র-অভিযান বা ভ্রমণের (exploration) মাধ্যমে বিজিত দেশগুলো দখল এবং নানা তথ্য-উপাত্ত করতলগত করার কারণে ইয়োরো-মানসিকতায় এক ধরনের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল; এরই অনুষঙ্গে দেখা দিয়েছিল প্রভু-দাসের অমোচনীয় যুগ্ম-বৈপরীত্য (Binary-opposition)।

ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স — এসব দেশ পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে মূলত জয় করেছিল গোটা পৃথিবীকে। ওইসব সমুদ্রযাত্রা কেবল দেশজয়ই ছিল না, ছিল তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞানভাণ্ডার আহরণের অনন্ত অভিযাত্রা। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও ভূগোল-জ্ঞানের মাধ্যমে ইয়োরোপ অন্য জাতির দুর্বলতা ও সম্পদ সম্পর্কে যেমন অবহিত হয়েছিল, তেমনি ধারণা লাভ করেছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তি ও

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্ভাবনা সম্পর্কে। বোধ করি এ কারণেই কথাকোবিদ ফ্রানৎস্ কাফফা ইয়োরোপের সমুদ্রজয়কে আখ্যায়িত করেছিলেন জ্ঞানযন্ত্র বা knowledge machine (Kafka 2007 : 31) অভিধায়। নবলব্ধ এই জ্ঞান দ্বারা ইয়োরোপ যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তা গভীরভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে, বিজিত দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয় সে যুগ্ম-বৈপরীত্য এবং বিজিত দেশগুলোর মানুষদেরও বাধ্য করায় সে যুগ্ম-বৈপরীত্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের কিছু নমুনা এ রকম : শাসক/শাসিত, সাদা/কালো, সভ্য/অসভ্য, উন্নত/আদিম, গতিশীল/স্থবির, ভালো/মন্দ, সুন্দর/অসুন্দর, মানবিক/পাশব, শিক্ষক/শিক্ষার্থী, জ্ঞানী/মূর্খ, চিকিৎসক/রোগী, কেন্দ্র/প্রান্ত ইত্যাদি। লেখাই বাহুল্য যে, এসব যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথমটি নির্দেশ করে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে, আর দ্বিতীয়টি উপনিবেশিত পৃথিবীকে। ইয়োরোপ বুঝাতে চেয়েছিল, যা কিছু ভালো, সুন্দর, মানবিক এবং যৌক্তিক তার সবটাই ইয়োরোপের; উপনিবেশিত পৃথিবী কেবলই অসুন্দর, অমানবিক, ইতর, মূর্খ আর প্রান্তিক। ইয়োরোপ বুঝাতে চাইলো এবং বুঝাতে পারলো যে, সাদারাই মানবিক এবং সুন্দর; ভালোর অধিকার কেবল সাদাদের; পক্ষান্তরে কালোদের জন্ম হয়েছে শাসিত হবার জন্য, সাদাদের সেবা করার জন্য। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে অধিকৃত ভূখণ্ড ও মানবমণ্ডলী (natives) সম্পর্কে একটা পার্থক্যসূচক মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠা করে দিল ইয়োরোপ। এই পার্থক্য সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক — সব দিকেই ক্রমে প্রভাব বিস্তার করল। যুগ্ম-বৈপরীত্য বা এই পার্থক্য এই বোধ সঞ্চার করল যে, যেহেতু এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তৃত ভূভাগ অসভ্য, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত এবং অনুন্নত, তাই তাদের কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তির দূত হিসেবে ইয়োরোপীয় শক্তি এসেছে। এই যুগ্ম-বৈপরীত্য এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করল যে, ইয়োরোপ হচ্ছে উন্নত ও সভ্য, অবশিষ্ট বিশ্ব হচ্ছে অনুন্নত এবং অসভ্য; ইয়োরোপ হচ্ছে কেন্দ্র (centre) এবং অবশিষ্ট বিশ্ব হচ্ছে তার প্রান্ত (periphery)। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য :

> Colonialism could only exist at all by postulating that there existed a binary opposition into which the world is divided. The gradual establishment of an empire depended upon a stable hierarchical relationship in which the colonized existed as the other of the colonizing culture. Thus the idea of the savage could occur only it there was a concept of the civilized to oppose it. In this way a geography of difference was constructed, in which differences were mapped (cartography) and laid out in a metaphorical landscape that represented not geographical fixity, but the fixity of power. Imperial Europe became defined as the 'centre' in a geography at least as metaphysical as physical. Everything that lay outside that centre was by definition at the margin or the periphery of culture, power and civilization. (Ashcroft 2013 : 36-37)

সর্বকালের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চায় কেন্দ্র-প্রান্তের এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের সম্পর্কটি দৃঢ়বদ্ধ ও অবিচল রাখতে। যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক সম্পর্কের অবিচলতার উপরই নির্ভর করে

সামাজ্যবাদের সাফল্য ও স্থায়িত্ব এবং বিজিত জনগোষ্ঠীকে হীনবল রাখার প্রত্যাশিত সফলতা। ফলে ইয়োরোপের সমুদ্র বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোতে কেবল বাণিজ্যপণ্যই নয়, অধিকৃত ভূখণ্ডে চালান হতে থাকে আরো অনেক কিছু — ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন, এমন-কি মানবিক চিন্তন-প্রক্রিয়া পর্যন্ত, যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ ও তার অধিবাসীদের উপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও মানসিক আধিপত্য বিস্তার।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচ্য। সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য-বিস্তারের তত্ত্বদর্শন, আর উপনিবেশবাদ হচ্ছে তার প্রায়োগিক বাস্তবতা। এডওয়ার্ড সাঈদ এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন — সাম্রাজ্যবাদ হল মেট্রোপলিটান কেন্দ্রের দূরবর্তী অঞ্চলে কর্মকাণ্ড ও কর্তৃত্ব করার মানসিকতা, পক্ষান্তরে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এই মানসিকতা বাস্তবায়িত করে উপনিবেশ (Said 1993 : 26)। উপনিবেশিত সমাজে ইয়োরোপীয় শক্তি শাসক ও শোষিতের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক নির্মাণ করেছে ফ্রাঞ্জ ফানো তাঁর *Black Skin, White Masks* গ্রন্থে তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – উপনিবেশী শাসনের কারণে উপনিবেশক এবং উপনিবেশিত উভয়ের মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ঔপনিবেশিক শক্তির সচেতন চেষ্টায় স্থানীয়দের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ক্ষয় হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যায় অথবা মরে যায়। উপনিবেশিতের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তার এই ক্ষয় বা মৃত্যু তার মনে জন্ম দেয় একরকম হীনমন্যতাবোধ ও অধঃস্তনচেতনা (Fanon 1986 : 10)। ঔপনিবেশিক শক্তির অব্যাহত প্রচেষ্টায় উপনিবেশিতের মনে উপনিবেশী সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্টি করে এক অমোঘ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একই সঙ্গে আপন ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনমন্যতাবোধ। স্মরণ করা যাক ফানোর ভাষ্য :

> উপনিবেশবাদ শুধু জনগোষ্ঠীকে এর আয়ত্তে শৃঙ্খলিত করেই তৃপ্ত থাকে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কের বিকাশ ও ঘিলু অসার করে দেয়। কোন এক বিকৃতবুদ্ধি যুক্তির মাধ্যমে লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ করা হয় এবং তাদের বিকৃত অবয়বহীন এবং ধ্বংস করা হয়। (Fanon 2006 : 28)

এভাবে আধিপত্যবাদী দর্শন চারশ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়োরোপীয়দের শক্তি যুগিয়েছে — পৃথিবীকে করেছে লুণ্ঠন। উনিশ-বিশ শতকে আধিপত্যবাদী এই শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড। একইভাবে ভারতবর্ষও বন্দি হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এই সাংস্কৃতিক-জালে। উপনিবেশী শক্তির এই প্রচেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলের বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপনিবেশিত মানুষদের 'সাদা মুখোশ' (white masks) পরানোর কৌশল হিসেবে মেকলে লিখেছেন :

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. (Woodrow 1862 : 115)

— অর্থাৎ বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্য হিসেবে উপনিবেশী শক্তি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পরিকল্পনারই প্রত্যক্ষ ফল উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উপনিবেশী শক্তির এই বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয় নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর নিম্নোক্ত ভাষ্যে :

> সমষ্টিগত প্রতিরোধীদের বিরুদ্ধে সামাজ্যবাদ সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র পরিচালনা করেছে সেটা হল সাংস্কৃতিক বোমা। এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হল মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়ো ভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা। ... নিজেদের সৃষ্টি এই পোড়ো ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে উপস্থাপন করে থাকে ত্রাতার আদলে এবং দাবি করতে থাকে অধীনস্থরা সমস্বরে গাইবে : 'চৌর্যবৃত্তি হল পবিত্র'। (থিয়োঙ্গে ২০১০ : ১৫)

ঔপনিবেশিক শক্তি কীভাবে উপনিবেশিতের মনোলোকে ও বিশ্বাসে প্রবেশ করিয়ে দেয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, তার একটা নমুনা পাওয়া যায় মলয় রায়চৌধুরীর বিশ্লেষণ থেকে। মলয় লিখেছেন : 'আমরা অনেককে একটা কথা প্রায়ই বলতে শুনি। কথাটি হল তিক্ত অভিজ্ঞতা। কেউ যদি কথাটা ব্যবহার করেন তাহলে আমরা ভাসা ভাসা টের পাই তিনি কি বলতে চাইছেন। কথাটি ঔপনিবেশিক। সাম্রাজ্যবাদী শাসন এদেশে কায়েম হবার ফলে অভিব্যক্তিটি বাংলা ভাষার অন্তর্গত হয়েছে নেতিবাচক বা খারাপ তাৎপর্যের দ্যোতক হিসেবে। প্যারাডাইমটি স্বাদ সম্পর্কিত। এখন বলা হল বাঙালি সংস্কৃতিতে তেতো ব্যাপারটি খারাপ নয়। বাঙালি প্রথম পাতেই করলা খেতে ভালবাসে। তিতকুটে মেথিফোড়ন খেতে পছন্দ করে। শুক্ত তার প্রিয় খাদ্য। তাহলে তিক্ত অভিজ্ঞতা তার অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হতে পারে না। শাসকের অভিব্যক্তি কালক্রমে হয়ে গেছে বাঙালির অভিব্যক্তি, কেননা ইংরেজদের মধ্যে তেতো খাবার চল নেই। তেতো তাদের কাছে খারাপ স্বাদ। যে বাঙালি লেখক 'তিক্ত অভিজ্ঞতা' কথাটি ব্যবহার করেন, তিনি তা না ভেবেই করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদীর সাংস্কৃতিক দ্যোতকের ওপর নির্ভর করেন। তিনি বলতে চান বাঙালি জীবনের কথা অথচ বলেন ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ভাষায়।' (মলয় ১৯৯৬ : ২১)

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ উপনিবেশিত দেশগুলোর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ধ্যান বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বিজিত জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। উপনিবেশিত দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের দলে নেওয়ার চেষ্টা করে ঔপনিবেশিক শক্তি, প্রচার মাধ্যমকে তারা করে কুক্ষিগত। উপনিবেশিতের সাংস্কৃতিক জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপই হয় উপনিবেশী শক্তির সহজাত প্রবণতা। *মনোজগতে উপনিবেশ : তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে একথাই ব্যাখ্যা করে মফিদুল হক লিখেছেন :

> বিশ্বব্যাপী তথ্য আধিপত্যের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্যের রয়েছে খুব নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তৃতীয় বিশ্বের নামে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আজ যে একক নয়া-উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক শোষণে বশীভূত, তার অনুষঙ্গ হিসেবেই গোটা বিশ্বের তথ্য-

> কাঠামোকে একটি এক কেন্দ্রের অধীনস্থ রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে একটি তথাকথিত পশ্চিমী ছাঁচে ঢাকা আধুনিক সংস্কৃতির অবয়ব প্রতিষ্ঠা। পত্রিকান্তরে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এক খবর — পেরুর ট্রুজিল্লো শহরের ২০০ তরুণ তাদের নাসিকা সার্জারির সহায়তায় মার্কিন পপগানের জনপ্রিয় গায়ক মাইকেল জ্যাকসনের নাকের আদলে করে নিয়েছেন। খবরটা হাস্যকর আবার ভয়ংকরও বটে। বস্তুত গোটা তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে জাতীয় সংস্কৃতির এমনি নাসিকা কর্তন আজ অব্যাহত গতিতে চলছে। (মফিদুল ১৯৮৫ : ৯)

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দেশে-দেশে ক্রমে দেখা দেয় প্রবল প্রতিরোধ চেতনা। উপনিবেশীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ চেতনারই তাত্ত্বিক নাম Post-colonialism বা উত্তর-উপনিবেশবাদ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশিতের ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংসের যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং নিজেদের আধিপত্যমুক্ত করার মানসে জ্ঞানচর্চার পথ নির্মাণ করা এবং সজ্ঞচেতনায় জাগ্রত হওয়ারই তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও উপায় হল উত্তর-উপনিবেশবাদ।

ঔপনিবেশিক শক্তির ছদ্মবেশ উন্মোচনই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রধান লক্ষণ। এ সূত্রেই আসে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংস্কৃতির কথা। আত্ম-পরিচয় সন্ধানে এবং প্রতিরোধের জন্য শক্তি-সঞ্চয়ের বাসনায় উপনিবেশের মানুষ বিশেষত সৃষ্টিশীল প্রতিভা মিথ-পুরাণ-রূপকথা-উপকথাকে অবলম্বন করে নির্মাণ করে নবতর এক জীবন সংবেদ — মিথ-পুরাণ-ঐতিহ্যের ঘটে নবজন্ম। চির-উপেক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষ এবং লাঞ্ছিত নিরুচ্চার নারী অধিকার ঘোষণায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে — খুঁজে নিতে চায় তারা আপন অস্তিত্বের মৃত্তিকা। জীবনে-সংস্কৃতিতে-সাহিত্যে-রাজনীতিতে অর্থাৎ সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরনের আধিপত্যপ্রবণ মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে তার বিপরীতে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দ্যের শক্তি, তা আবিষ্কার করা এবং অদৃশ্য সজ্ঞচেতনা ও অস্তিত্বকে দৃশ্যমান করে তোলাই উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। (ফকরুল, ২০০৭ : ভূমিকা-৫)

উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য খুঁতে চায় নিজেকে, খুঁজতে চায় উপনিবেশিতের ঠিকানাকে, সত্তাকে, অস্তিত্বকে। নিজের স্বর সন্ধান তথা আত্ম-আবিষ্কারই এই ডিসকোর্সের প্রধান আহ্বান। ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচন এবং উপনিবেশিত সমাজের সামূহিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার তাগিদ থেকেই উত্তর-উপনিবেশবাদ আজ তাত্ত্বিক জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে বিশ্বজুড়ে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমী জ্ঞানকাণ্ডকে অস্বীকার করে নতুন জ্ঞানকাণ্ড সৃষ্টিই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের ঐতিহাসিক অবদান। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এবার আমরা দৃষ্টিপাত করব নজরুলসাহিত্যে, দেখতে চাইব এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে বিরাজমান আছে নজরুলরচনায়।

৩.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের উজ্জ্বল আবির্ভাব। তাঁর কবি-মানসের শিকড় প্রোথিত ছিল নবজাগ্রত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানস-মৃত্তিকায়। রাজনীতি-সচেতনতা ও জনমূল-সংলগ্নতা নজরুলের কবি-চৈতন্যে এনেছিল নতুন মাত্রা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সম্ভাবনা নজরুলের কবিমানসকে করে তুলেছিল আলোক-উদ্ভাসিত। তাই রোমান্টিক অনুভববেদ্যতায় তিনি বৈষম্যমূলক ঔপনিবেশিক সমাজের পরিবর্তে কল্পনা করেছেন শোষণমুক্ত সুষম সমাজের; অসত্য-অমঙ্গল-অকল্যাণের রাহুগ্রাস থেকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছেন স্বদেশের মাটি আর মানুষকে। যুদ্ধোত্তর বিরুদ্ধ প্রতিবেশে দাঁড়িয়েও তিনি গেয়েছেন জীবনের জয়গান, উচ্চারণ করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহের সূর্যসম্ভব বাণী।

পরম আশাবাদী নজরুল স্বদেশের মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন; ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করার আহ্বান জানিয়েছেন। উপনিবেশকে আঁকড়ে রাখার মানসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুচতুর কৌশলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষে; ভারতের দুই বৃহৎ ধর্ম-সম্প্রদায় পরস্পর বিভেদে জড়িয়ে পড়েছে বারবার। এর পশ্চাতে ছিল একাধিক রাজনৈতিক দলের ইন্ধন। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ নজরুলকে ব্যথিত করেছে। তাই তিনি সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সম্প্রীতি প্রত্যাশা করেছেন। সত্য-সুন্দর-কল্যাণের পূজারি নজরুল চেয়েছেন সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষের মুক্তি। বস্তুত, সাম্যবাদী চিন্তা তাঁর মানসলোকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে — হিন্দু ও মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে তাঁর চেতনায় হতে পেরেছে জাতিসত্তার পরিপূরক দুই শক্তি। তাই প্রকৃত সাম্যবাদীর মতো তিনি বলেন :

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা
ভাঙি' মন্দির, ভাঙি' মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্ত মেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হেষা! (নজরুল ১৯৬৭ : ৩৮৪)

— উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের সঙ্গে নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িক মানসতার সম্পর্ক কোথায়? উত্তর-উপনিবেশবাদ প্রতিরোধী চেতনা নিয়ে দাঁড়াতে চায় উপনিবেশের বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধী চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তি। সঙ্ঘশক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই নজরুল স্বপ্ন দেখেছেন মিলিত বাঙালির, স্বপ্ন দেখেছেন মিলিত ভারতবাসীর। এ সূত্রেই তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের প্রতিরোধী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। বস্তুত, মানুষকে, মানুষের ধর্মকে নজরুল বড় করে দেখেছেন আজীবন। তিনি চেয়েছেন মানুষের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল, স্বদেশের স্বাধীনতা। তাই হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, বিদ্রোহের জন্য মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী চেতনা সৃষ্টির জন্য আত্মসমীক্ষা এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন একটি জরুরি অনুষঙ্গ। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বে আত্মসমীক্ষার কথা গ্রামসীও জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন (Gramsci 1996 : 57)। ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত-অত্যাচার এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহীরূপে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন নজরুল। আত্মশক্তি উদ্বোধনের জন্য নজরুল প্রথমেই নিজেকে আবিষ্কারের কথা বলেছেন — যেমনটা বলেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায় : 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ' (নজরুল ১৯৬৭ : ২১)। নজরুলের নিম্নোক্ত ভাষ্যসমূহে আছে আত্মসমীক্ষা এবং আত্মআবিষ্কারের উদাত্ত আহ্বান :

> ক. আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত যদি লাথি মারতে পার, তা হ'লে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুভি। বল, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বল, আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থরথর করে কেঁপে উঠুক। বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। (নজরুল ১৯৬৭ : ৬৭৩)
>
> খ. পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে — সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে —
>
> আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ। (নজরুল ১৯৬৭ : ৬৯৭)
>
> গ. আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি — কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসায় এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, — আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, — তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা, আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। (নজরুল ১৯৬৭ : ৭২২)

— স্পষ্টতই লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নজরুলমানসের দ্রোহী সত্তার মৌল চারিত্র্য হয়েছে উন্মোচিত। বিদ্রোহের জন্য, প্রতিরোধের জন্য আত্মসমীক্ষা এবং আত্মআবিষ্কার বাসনাই এসব ভাষ্যের মূল কথা। পরাধীনতার গ্লানিতে নজরুলচিত্ত দীর্ণ হয়েছে, এবং এই গ্লানি থেকে মুক্তির অভিলাষে তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। তবে, কেবল দেশের স্বাধীনতা-কামনাতেই তাঁর দ্রোহীচিত্তের তৃপ্তি ছিল না — তাঁর বিদ্রোহ ছিল একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, ইতিহাসনিন্দিত চেংগিসের মতো নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর, ভৃগুর মতো ভগবানের বুকে পদাঘাত-উদ্যত, মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প, ধ্বংসের আবাহনে উচ্ছ্বসিত, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় উদ্বেলিত।

প্রতিরোধ-বাসনায় কবিতা নজরুলের কাছে হয়ে উঠেছে সামাজিক দায়িত্ব পালনের শাণিত আয়ুধ। নজরুলের প্রতিরোধচেতনা বা দ্রোহভাবনার মধ্যে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় :

ক. অসত্য অকল্যাণ অমঙ্গল এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ;
খ. স্বদেশের মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এবং
গ. শৃঙ্খল-পরা কবির 'আমিত্ব'-কে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিদ্রোহ।

— বস্তুত, নজরুলের সৃষ্টিকর্মে এই ত্রয়ীধারা সর্বদা সক্রিয় থেকেছে। তাঁর প্রতিরোধচেতনা ছিল সৃষ্টিশীল, ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে স্বদেশের মুক্তিকামনায় আকুল। তিরিশি অবক্ষয় হতাশা কিংবা নৈরাশ্যবাদিতা-যৌনতা কোনক্রমেই তাঁর কবিমানসকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর বিদ্রোহ সৃষ্টিশীল বলেই তিনি ধ্বংসের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির আশ্বাস। অসুন্দরের মৃত্যুকামনা করে তিনি বরণ করেছেন চিরসুন্দরকে :

ধ্বংস দেখে ভয় তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন — জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে' —
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর। (নজরুল ১৯৬৭ : ২১)

একথা অনস্বীকার্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহ করেছেন অসত্য অন্যায় অকল্যাণ ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে — সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। সন্দেহ নেই, তাঁর বিদ্রোহ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও কল্যাণবোধ থেকে উৎসারিত। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আমিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার মুক্তিপ্রত্যাশী। নবজাগরণের ফলে ধর্মশাসিত শৃঙ্খল-পরা মানুষের মুক্তি ঘটেছে, মুক্তি ঘটেছে মানুষের অবরুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' এই নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্প-নির্মিতি। মহাকাশ ছাপিয়ে, ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে নজরুল হয়েছেন বিশ্ববিস্তারী — আমিত্বের অহঙ্কারে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন এই প্রত্যয়দীপ্ত চরণগুচ্ছে :

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য।
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির! (নজরুল ১৯৬৬ : ২৩)

— উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব আত্মসমীক্ষার কথা বলে, বলে আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথা। গোটা 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই তো আত্মসমীক্ষা ও আত্মশক্তি উদ্বোধনের এক অনুপম শিল্পপ্রতিমা। বস্তুত, প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন মানুষের আত্মতা ও আত্মশক্তির বিশালতা।

ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিরোধের বাসনা থেকে সৃষ্টিশীল প্রতিভা, শক্তি সংগ্রহের জন্য, অবগাহন করেন মিথ-পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-রূপকথা-উপকথার জগতে। সৃষ্টিক্ষম

প্রজ্ঞার জাদুস্পর্শে সংরক্ত সমকালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে মিথ-পুরাণ ইতিহাস-ঐতিহ্য লাভ করে পুনর্জন্ম। পুরাণ ইতিহাস ঐতিহ্য ও মিথিক অনুষঙ্গ কবির চেতনায় সঞ্চার করে অসীম অতল অতুল শক্তির উপলব্ধি। এই শক্তিই কবিকে বর্তমান অবরুদ্ধ অবস্থা ভাঙার সাহস জোগায় — তাঁকে করে তোলে দ্রোহী-প্রতিবাদী-প্রতিরোধী এবং প্রত্যাঘাতপ্রবণ। মিথ কবিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী — সে-স্বপ্ন ব্যক্তিক নয়, সামষ্টিক। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বিল ময়ার্সের সঙ্গে কথোপকথনকালে জোসেফ ক্যাম্ববেলের অভিমত — 'স্বপ্ন আমাদের সচেতন জীবনের ভরসা — গভীর, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; আর মিথ আমাদের সমাজের স্বপ্ন। মিথ হলো গণস্বপ্ন, পক্ষান্তরে স্বপ্ন হচ্ছে ব্যক্তিগত মিথ' (Campbell 1988 : 49)।

নজরুল-কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব দ্রোহ ও প্রতিরোধ, আর এই দ্রোহ ও প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষার সপক্ষে শক্তি সঞ্চয়ের বাসনায় নজরুলের ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণস্মরণ। ঔপনিবেশিক শোষণ এবং যুদ্ধোত্তর অবক্ষয় বিপর্যয় ও শূন্যতার পটভূমিতে জীবনের পরমার্থ আবিষ্কারে নজরুল সচেতনভাবে স্মরণ করেছেন ঐতিহ্যিক-পৌরাণিক নানা চরিত্র ও অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্য মিথ–পুরাণ ব্যবহার-বৈচিত্র্যে হয়ে উঠেছে শিল্পমণ্ডিত, তা বিকিরণ করেছেন নতুন ব্যঞ্জনা নবতর মাত্রা। অর্জুন দুর্বাসা ভীম বিশ্বামিত্র জমদগ্নি বিষ্ণু পরশুরাম বলরাম ভৃগু প্রহ্লাদ চণ্ডী দুর্গা শিব প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র এবং পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসপুঞ্জ কিংবা মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ঐতিহ্য অথবা ইয়োরোপীয় অর্ফিয়াস প্লুটো ইত্যাদি নজরুল-কবিতায় নির্মাণ করেছে মিথ-পুরাণ ও ঐতিহ্যের এক অতি চৈতন্যলৌকিক বলয় (আকরম ১৯৮৫ : ৭৫)। মিথ ও পুরাণের বহুমাত্রিক ব্যবহারে নজরুলের কবিচৈতন্যে সামূহিক নির্জ্ঞান ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির (Jung 1974 : 205-32) মেলবন্ধন ঘটেছে।

বাংলা কবিতায় নজরুলের বিশিষ্টতা এই যে, ভারতীয় মিথ-পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ব্যবহারে তিনি অর্জন করেছেন অনন্য সাফল্য। নান্দনিক ঐকান্তিকতায় এবং জৈবসমগ্র ঐক্যসূত্রে দুই ভিন্ন উৎসের শিল্প-উপাদান নজরুল-কবিতায় সৃষ্টি করেছে মূর্ছনার ঐকতান। এ সূত্রে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নজরুলের ঐতিহ্যিক-উত্তরাধিকার প্রসঙ্গটি। উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ঋদ্ধিশালী (মোতাহের ১৯৭২ : ৩৩-৩৪)। নজরুল জন্মসূত্রে ভারতীয়, তাই ভারতীয় উত্তরাধিকারকে তিনি আপন উত্তরাধিকার হিসেবেই জেনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ধর্মসূত্রে তিনি ছিলেন পশ্চিম এশীয় তথা ইসলামের অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তিনি সচেতনভাবে উভয় ঐতিহ্যকে লালন করেছেন আপন কবিসত্তায়। তাই একই কবিতায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি সার্থকভাবে মেলাতে পেরেছেন পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস-ঐতিহ্য — যে হাতে লিখেছেন শ্যামাসঙ্গীত-শাক্তপদ, সেই হাত দিয়েই লিখতে পেরেছেন গজল আর ইসলামি গান। উভয় ঐতিহ্য থেকে শক্তি ও প্রেরণা চয়ন করে নজরুল তা ব্যবহার করতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে। ঔপনিবেশিকতার

বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নজরুল প্রত্যাশা করেন দুর্গার আবির্ভাব, যে দুর্গা পৌরাণিক আসুরিকতাকে ধ্বংস করার মানসে স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছিলেন মর্তে, নিপীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য :

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব নাশিনী চণ্ডী-রূপ
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ স্তূপ।
শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা। (নজরুল ১৯৬৭ : ২৭)

ঔপনিবেশিক শক্তিকে ধ্বংস করে নজরুল নির্মাণ করতে চেয়েছেন একটি সুষম বণ্টনভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্র। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার স্মারক হয়ে আসে পুরাণের শিব — নটরাজ সত্তায় শিব ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মাণ করে সৃষ্টির সৌধ, যা নজরুলের মানস-আকাঙ্ক্ষারই রূপান্বিত ছবি :

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর। ...
ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর। (নজরুল ১৯৬৭ : ২৭)

পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য মিথ-উৎস ব্যবহারেও নজরুল তাঁর দ্রোহচেতনাকেই রেখেছেন কেন্দ্রীয় ভরকেন্দ্রে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য শক্তি দরকার, এবং শক্তির সন্ধানেই তিনি হাজির হয়েছেন পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহ্যলোকে। মোহররমের শোককে কবি পরিণত করেন শক্তিতে, হযরত ইব্রাহিমের ত্যাগধর্মকে তিনি সঞ্চারিত করেন দেশের তরুণ-সৈনিকদের মানসলোকে। লক্ষণীয় নিম্নোক্ত চরণগুচ্ছ :

ক. ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা, —
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না। (নজরুল ১৯৬৭ : ৩৯)

খ. ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
জোর চাই, আর যাচনা নয়,
কোরবানী-দিন আজ না ওই?
বাজনা কই? সাজনা কই? ...
আজ আল্লাহর নামে জান্ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন। (নজরুল ১৯৬৭ : ৪১)

— উপর্যুক্ত দু'টি উদ্ধৃতিতেই পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রতিরোধী যুদ্ধের জন্য নজরুলকে সঞ্চার করেছে সীমাহীন শক্তি ও সাহস।

নিম্নবর্গ বা প্রান্তজনের উত্থানবাসনা উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসে নজরুল ছিলেন প্রান্তবাসী, তাঁর অবস্থান ছিল নিম্নবর্গে। নিম্নবর্গের প্রতি ভালোবাসা, প্রান্তজনের প্রতি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার থেকে নজরুল কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন ছোটগল্প উপন্যাস প্রবন্ধ। উৎপীড়িত বা প্রান্তজনের মুক্তির জন্যই নজরুল বিদ্রোহ করেছেন। এই বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ-যুদ্ধে নজরুল পুরুষের পাশাপাশি নারী-শক্তিকেও আহ্বান করেছেন। 'বারাঙ্গনা', 'নারী' — এসব কবিতায় পাওয়া যায় এই প্রত্যয় — নজরুল নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে, দেখেছেন সামাজিক জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিম্নবর্গ তথা প্রান্তজনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন — 'Can the subaltern speak' (Gayatri 1990 : 31)? নজরুলের কবিতা ও কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ কথা বলেছে, প্রতিবাদ করেছেন, বিদ্রোহ করেছে। 'ব্যথার দান' গল্পের গুলশান, 'রাক্ষুসী' গল্পের বিন্দি, 'পদ্মগোখরো' গল্পের জোহরা, *কুহেলিকা* উপন্যাসের জাহাঙ্গীরের মা, কিংবা জয়তী ও চম্পা, *বাঁধনহারা*-র আয়েশা, *মৃত্যুক্ষুধা*-র প্যাকালের মা কিংবা মেজ বউ নিম্নবর্গ বা প্রান্তজনের লক্ষ্মণরেখা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে আলোকিত পৃথিবীতে, কথায় ও কাজে তারা মুখর করে তোলে তাদের চারদিককার পৃথিবীকে। জাহাঙ্গীর কিংবা আনসারের মুখেও আমরা শুনি ওই প্রান্তজনের গলা-ফাটানো উত্থান-কথা। অতএব, সামসময়িক সাহিত্যের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে, নজরুলের কথাসাহিত্যের এই মর্ম উপলব্ধি করে গায়ত্রীর জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বলতে পারি — 'Yes, the subaltern can also speak'।

নজরুল বিদ্রোহী কবি, নজরুল প্রান্তজনের লেখক। তাঁর রচনায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায়, কথা-সাহিত্যে, প্রবন্ধে নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অঙ্কনই করেননি, বরং তিনি কামনা করেছেন নিম্নবর্গের মানুষের, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান। উত্তর-ঔপনিবেশিক নজরুল বাংলা সাহিত্যে যথার্থই এক বিরল, ব্যতিক্রমী, প্রাতিস্বিক, অদ্বিতীয় এবং অনতিক্রান্ত প্রতিভা।

## গ্রন্থপঞ্জি


কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৬৭। *নজরুল-রচনাবলী*-প্রথম খণ্ড, ঢাকা।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০১০। *ডিকলোনাইজিং দ্যা মাইন্ড*, অনুবাদ : দুলাল আল মনসুর, ঢাকা।

ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদক), ২০০৭। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, ঢাকা।

মফিদুল হক, ১৯৮৫। *মনোজগতে উপনিবেশ : তথ্য-সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা।

মলয় রায় চৌধুরী, ১৯৯৬। 'উত্তর-ঔপনিবেশিকতা', *পোস্টকলোনিয়ানিজম : উত্তর-ঔপনিবেশিতকতা* সম্পাদক : সমীর রায় চৌধুরী, কলকাতা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ১৯৫৮। *সংস্কৃতি-কথা*, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা।

Antinio Gramsci. 1996. *Selections from the Prison Note-Books*, Madras.

Bill Ashcroft et. al. (eds), 1995. *The Post-Colonial Studies*, London.
C. G. Jung, 1974. 'Achetypes of the Collective Unconscious' in *Twentieth Century Criticism : The Major Statements*, editor : William J Handy & Max Westbrok, New Delhi.
Edward W. Said, 1993. *Culture and Imperialism*, London.
Frantz Fanon, 1986. *Black Skin, White Masks*, translated by Charles Markmann, London.
Frantz Fanon, 2006. *The Wretched of the Earth* (*জগতের লাঞ্ছিত*, অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া), ঢাকা।
Franz Kafka, 1919. *In the Penal Colony*, New York.
Gayatri Chakravorty Spivak, 1990. *The Post-Colonial Critic*, New York.
H. Woodrow, 1862. *Macaulay's Minutes on Education in India*, Calcutta.
Joseph Campbell, 1988. *The Power of Myth*, New York.